টেকসই উন্নয়নের রূপরেখা: বর্জ্য-কার্বনমুক্ত সভ্যতা ও সামাজিক উদ্যোগ

এ এইচ এম মাসুম বিল্লাহ

পৃথিবী এখন নানা পরিবেশগত ইস্যুতে সংকটে রয়েছে। এই সংকটের মধ্যে টিকে থাকতে ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য রাখতে আমাদের জীবনধারা নতুনভাবে ভাবার সময় এসেছে। আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত কপ-২৯ সম্মেলনে লিডার্স ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিটের উদ্বোধন অধিবেশনে বিশ্ব নেতাদের উদ্দেশে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস এ বিষয়ে বিশ্ববাসীকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি সামাজিক ব্যবসার প্রসার মাধ্যমে বর্জ্য ও কার্বন মুক্ত জীবনধারা গ্রহণের উপর জোর দিয়েছেন। টেকসই ভবিষ্যত নির্মাণের জন্য সবার একসঙ্গে কাজ করা অপরিহার্য। এখানে সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা-সবার ভুমিকাই গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ কার্বন নিঃসরণ। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, শিল্প উৎপাদন, আর পরিবহণ থেকে নির্গত কার্বন এই সমস্যার প্রধান উৎস। এর পাশাপাশি বর্জ্য দূষণ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। কার্বন ও বর্জ্য মুক্ত জীবনধারার সমন্বিত প্রয়াসই হতে পারে টেকসই ভবিষ্যতের রূপরেখা। এই জীবনধারা চর্চা করতে হলে পরিবেশের উপর আমাদের দৈনন্দিন কাজের নানান প্রভাব নিয়ে নতুন করে ভাবা প্রয়োজন। খুব ছোটো ছোটো পদক্ষেপ, যেমন- ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে গণপরিবহণ ব্যবহার করা বিদ্যুৎসাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার, পরিত্যক্ত পণ্যের পুনর্ব্যবহার ও কম্পোস্টিংয়ের মাধ্যমে জৈব বর্জ্য কমানো—এগুলো গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য এনে দিতে পারে। এছাড়া, বৃহত্তর পরিসরে, জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে আরও ঝোঁকা এখন সময়ের দাবি। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ও জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করলে কার্বন নিঃসরণ কমে এবং পরিবেশের দূষণও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসে। ঠিক তেমনি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পুনর্ব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের চর্চা জোরদার করার মাধ্যমে শূন্য বর্জ্যে পৌঁছানোর লক্ষ্য অনেকটাই অর্জন করা সম্ভব। এর ফলে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হয় এবং আমাদের সম্পদের অপচয় রোধ করা সহজ হয়।

শূন্য কার্বন এবং শূন্য বর্জ্য নিশ্চিত করতে আমাদের অর্থনৈতিক অভ্যাসেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত, টেকসই, এবং দীর্ঘস্থায়ী পণ্য কিনলে পরিবহনের সময় যে কার্বন নিঃসরণ হয় তা অনেকাংশে কমানো সম্ভব। এর সাথে অপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনে জমিয়ে রাখার বদলে কেবল প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা এবং তা পুনর্ব্যবহার করার অভ্যাস গড়তে হবে। এতে আর্থিক সাশ্রয় হয় এবং পরিবেশ সুরক্ষিত থাকে।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে সরকারের নীতিগত ভূমিকা কিংবা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সাথে সামাজিক ব্যবসার উদ্যোগের সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব। সামাজিক ব্যবসায়িক উদ্যোগে আর্থিক মুনাফার সাথে সাথে মানুষের কল্যাণ ও পরিবেশের উন্নয়নকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। সামাজিক ও পরিবেশগত বিভিন্ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে কিংবা সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা থেকে সামাজিক ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে, গ্রামের নারীদের তৈরি পরিবেশবান্ধব পণ্য বাজারজাত করতে বাংলাদেশের বেশ কিছু সামাজিক উদ্যোগ কাজ করছে। আবার কিছু সামাজিক উদ্যোগ টেকসই কৃষির উন্নয়নে কাজ করছে, যা একইসাথে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখে ও পরিবেশগত ক্ষতি কমায়। তবে, চক্রাকার অর্থনীতিকে (সার্কুলার ইকোনমি) ভিত্তি করে পরিবেশবান্ধব পণ্য তৈরিতে সামাজিক উদ্যোগগুলো আরও এগিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে। পণ্যগুলোর নকশা ও উৎপাদন প্রক্রিয়া এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে তা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এতে বর্জ্য কমবে ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে।

টেকসই উন্নয়নের সাথে জড়িত সামাজিক উদ্যোগগুলো এখন বিভিন্ন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। নবায়নযোগ্য শক্তি, টেকসই কৃষি ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের মতো ক্ষেত্রগুলোতে আরও কাজের সুযোগ সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। টেকসই খাতে যত বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে, সমাজে এই আন্দোলন তত শক্তিশালী অবস্থান পেতে সক্ষম হবে। সামাজিক উদ্যোগ একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে একটি সুন্দর এবং টেকসই ভবিষ্যত বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রসার ও টেকসই জীবনধারা গড়ে তুলতে শিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হলে ছাত্রছাত্রীরা এসব বিষয় দক্ষতা অর্জন ও মানসিকতা গড়ে তুলতে পারবে। পর্যায়ক্রমে তারা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল উপায় উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবে।

উদ্যোক্তা শিক্ষায় টেকসই উন্নয়নের ধারণা সংযুক্ত করতে শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আন্তঃসম্পর্ক ধারণা দিতে হবে। সবুজ ব্যবসার মডেল, চক্রাকার অর্থনীতি ও টেকসই পণ্যের উদ্ভাবন পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষার মূল্যবোধ শক্তিশালী হবে। শিক্ষার্থীরা এমন সিদ্ধান্ত অনুপ্রাণিত হবে যা একইসাথে আর্থিকভাবে লাভজনক ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখে।

সবুজ-উদ্যোক্তা বিষয়ক পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল সমাধানের মাধ্যমে পরিবেশগত সমস্যাগুলো চিহ্নিত ও মোকাবিলা করার শিক্ষা অর্জন করবে। নবায়নযোগ্য শক্তি, বর্জ্য থেকে সম্পদ তৈরি ও টেকসই সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের এমন ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করতে উৎসাহিত করবে, যা বাস্তব সমস্যার পরিবেশবান্ধব সমাধান দিবে। এ সকল বিষয়ে হাতেকলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপের সুযোগ বা পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

তরুণদের উদ্যোগে পরিচালিত ব্যবসাসমুহ সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। টেকসই কৃষি থেকে শুরু করে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি বিকাশসহ অন্যান্য পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ তরুণদের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী পরিবর্তন এনে দিতে সক্ষম। প্রয়োজনীয় পরামর্শ, প্রাথমিক তহবিল ও ইনকিউবেশন সহায়তার সুযোগ দিয়ে তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা আরও প্রসারিত ও সফল করা সম্ভব। এতে সামগ্রিক ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হবে।

টেকসই উন্নয়নের মূল্যবোধকে ধাপে ধাপে সামাজিক আদর্শে রূপ দিতে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষার্থীরা ভোক্তার দায়িত্ব, নৈতিক ব্যবসাপদ্ধতি ও কমিউনিটির সাথে জড়িত থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে শিখলে তারাও পরবর্তীতে টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে। সময়ের সঙ্গে একসময় তাদের কাজ সহপাঠী, পরিবার ও বৃহত্তর সমাজকে প্রভাবিত করবে। এতে পরিবেশগত দায়িত্বশীলতার বিষয়ে মানুষের মননে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

জলবায়ু পরিবর্তন কিংবা পরিবেশের ক্ষতির মতো বিষয় জটিল এবং বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার এদের সাথে যুক্ত থাকে। এসব সমস্যার সমাধানে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়নকে ব্যক্তিগত বিষয়ের চেয়েও বড় কিছুর স্বীকৃতি দিতে হবে, সামাজিক উদ্যোগ শক্তিশালী করতে হবে। এবিষয়ে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসা প্রয়োজন।

টেকসই জীবনধারাকে আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকার- প্রত্যেকেই এজন্য ভূমিকা রাখতে হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নাগরিকরা সবাই একত্রিত হয়ে পরিবেশবান্ধব শক্তি, টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষায় অংশ নিলে তখন বৃহৎ পরিবর্তন আসে। সবার অংশগ্রহণের নিশ্চিত করা গেলে টেকসই উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়ন সামাজিক উদযাপনে পরিণত হবে।

আগামী প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য করতে টেকসই উন্নয়ন নিয়ে আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। দূষণ হ্রাস, প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব শক্তির উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে বাতাসের মান উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা সম্ভব। এতে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, যা টেকসই অভ্যাসকে আরও উৎসাহিত করবে। পরিবেশ সংরক্ষণের বাস্তব সুফল পেলে বিশ্বসমাজের সকলে টেকসই প্রক্রিয়ার প্রতি জোরালো সমর্থনে অব্যাহত রাখবে।

কপ-২৯ সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশনে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুসের ভাষণ টেকসই বিশ্ব গড়ার আশাবাদকে অনুপ্রাণিত করেছে। ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ লক্ষ্যে কাজ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে তিনি সবাইকে উৎসাহিত করছেন। তাঁর আশাবাদ টেকসই উন্নয়নের প্রতি বিশ্ববাসীর আগ্রহ আরও দৃঢ় হবে। শুধু টেকসই পৃথিবী নির্মাণ নয়, বরং যেকোনো জটিল সমস্যার সৃজনশীল সমাধান খুঁজতেও মানুষকে উদ্ভাবনী হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

টেকসই ভবিষ্যত গড়ে তুলতে প্রয়োজন পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। এজন্য ব্যক্তি পর্যায়ে পরিবর্তন, লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক ব্যবসা, যুবসম্পৃক্ততাসহ সম্মিলিত উদ্যোগকে একত্রিত করতে হবে। বিশ্বজুড়ে মানুষের মানসিক পরিবর্তন বৃহৎ পরিসরে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এনে দিতে পারে।

#

লেখক: পরিচালক (মিডিয়া) জনকূটনীতি অনুবিভাগ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা

পিআইডি ফিচার